বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে গুজরাতের পাঁচ কন্যা

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ভারত-পরিক্রমার সময় যখন গুজরাতে গিয়েছিলেন, তখন শুধু রাজা-দেওয়ানরাই নন, তাঁর সান্নিধ্যলাভ করে ধন্য হয়েছিলেন নারীরাও। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের কথা আমরা বিশেষভাবে জানতে পেরেছি।

মহারানি চিমনাবাই (দ্বিতীয়) : বরোদার মহারাজা শায়াজিরাও গায়কোয়াড়ের দ্বিতীয় পক্ষের সহধর্মিণী ছিলেন মহারানি চিমনাবাই (দ্বিতীয়) (১৮৭৩-১৯৪৩)। স্বামীজী বেলুড় মঠ থেকে মিস ম্যাকলাউডকে চিঠিতে (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০১) লেখেন, ''আমি আশা করি তুমি বরোদা যাবে এবং মহারানির (দ্বিতীয় চিমনাবাই) সঙ্গে দেখা করবে।'' স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দজীর কাছ থেকে জানা গেছে, রানি চিমনাবাই স্বামীজীর কথোপকথন ও ব্যক্তিত্বে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, পরবর্তী কালে তিনি স্বামীজীর বিভিন্ন রচনা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন।

বিবাহের পর গৃহশিক্ষিকার সহায়তায় শিক্ষালাভ করে চিমনাবাই বিদুষী হয়েছিলেন। তিনিও স্বামীর মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্না ছিলেন। সমাজের ভেদনীতিকে তিনি নিন্দা করেছেন দৃঢ়ভাবে। নারীশিক্ষা-প্রসারে নিয়ত মহারাজাকে উৎসাহিত করেছেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপচারিতা ও ভোজসভায় অংশগ্রহণ করলেও যা রুচিশীল নয় তা তাঁদের মুখের উপর বলতে দ্বিধা করতেন না তিনি। একবার এক পার্টিতে বিভিন্ন বিদেশি আনন্দোপকরণের সঙ্গে 'ভরতনাট্যম্'-এর অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠান শুরুর আগেই ব্রিটিশ মহিলারা আসর ত্যাগ করেন। পরে ইংরেজদের এক আসরে

উনিশ শতকের শেষ। নারীর দুরবস্থা অবর্ণনীয়। তবু যুগাচার্যের অমোঘ কৃপা তাঁদের ললাট ছুঁয়ে দিল। বিবেকানন্দ-আগুনের পরশমণি প্রাণে ছুঁইয়ে জীবন পুণ্য করে নিলেন কারা? লেখকের একনিষ্ঠ গবেষণা আর কঠিন পরিশ্রমের ফসল এই লেখা, যাকে বলা যায় বিবেকানন্দ-চরিত্র সম্পর্কে নব আবিষ্কার।

নিমন্ত্রিত হয়ে চিমনাবাই-ও অনুষ্ঠান শুরুর আগে সভাত্যাগ করেন।

তাঁর আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য, যেটি স্বামীজীর প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা নির্দেশ করে। মহারাষ্ট্রের মহিলা ভিকাজি রুস্তমজী কামা প্যারিসে থেকে দেশের বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। ১৯১১ সালের ১ মার্চ লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার স্যার হারবার্ট রিস্‌লে প্রবাসী ভারতীয়দের কার্যকলাপের যে-রিপোর্ট দেন, তাতে লেখা ছিল : "About August, 1910, the Maharani of Baroda was taking the cure at Vichy... at that time, Madam Cama was also at Vichy, and according to information received from Vichy, received numerous calls from Indians there."[১] মাদাম কামা বরোদার মহারানি প্রসঙ্গে নিয়তই ভূয়সী প্রশংসা করতেন। চিমনাবাই দেশের স্বাধীনতার জন্য মাদাম কামাকে নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন। গৃহবধূ এবং মহারানি হয়েও তিনি ছিলেন সিংহিনীর মতো তেজস্বিনী। স্বামীজীর সান্নিধ্যধন্যা এই মহীয়সী রমণী ছিলেন সমকালে একজন উল্লেখযোগ্য নারী।

স্বামীজীর সঙ্গে গায়কোয়াড়রাজ ও তাঁর রানির সাক্ষাৎকার-অঞ্চলটি শনাক্তকরণের চেষ্টা হয়েছে। স্বামীজীর গুজরাতভ্রমণ সম্পর্কে দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়েছেন স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দজী। তিনি তাঁর 'Swami Vivekanandaji's Wanderings in Gujarat' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, স্বামীজী যখন বরোদায় ভ্রমণ করছিলেন সেইসময় শায়াজিরাও গায়কোয়াড় বরোদায় ছিলেন না। তিনি নোনাভালি গিয়েছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে রাজারানির সাক্ষাতের সম্ভাব্য স্থান হল পুনে কিংবা মহাবালেশ্বর।[২] এর সমর্থনে আর একটি তথ্য উল্লেখ করা যায়। ফতে সিং রাও গায়কোয়াড় প্রণীত 'Sayaji Rao of Baroda–The Prince and The Man' গ্রন্থে দেখা যায় বরোদারাজ শায়াজিরাও তাঁর জীবদ্দশায় স্বদেশে থাকাকালে প্রতি গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতেন পুনে কিংবা মহাবালেশ্বরে এবং ১৮৯২-এর মে-জুন ও জুলাই মাসে তিনি সপরিবারে ওই দুই স্থানে অবস্থান করেছেন। 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দের বিবরণ অনুসারে ১৮৯২-এর মে-জুন মাসে স্বামীজী পুনে ও মহাবালেশ্বরে ছিলেন। এ-তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করে স্বামীজীর পুনেতে অবস্থানকালীন লিমডির ঠাকুরসাহেবের ১৩ মে ১৮৯২-এর দিনলিপি এবং মহাবালেশ্বরে অবস্থানকালীন ১৫ জুন ১৮৯২ জুনাগড়ে দেওয়ানজীকে লিখিত পত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২২ সালের আগস্টে স্বামী অভেদানন্দ যখন কাশ্মীরে ডাল হ্রদে হাউসবোটে অবস্থান করছেন, তখন শায়াজিরাও গায়কোয়াড় ও রানি চিমনাবাইও কাশ্মীরসফরে গিয়েছিলেন। স্বামীজীর গুরুভ্রাতা শ্রীনগরে আছেন জেনে চিমনাবাই লোক পাঠিয়েছিলেন গাড়ি করে তাঁকে নিয়ে আসতে। সাক্ষাতে চিমনাবাই অভেদানন্দজীকে বরোদায় গিয়ে একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলার জন্য অনুরোধ করে বলেন, এর যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করবেন।[৩] এই ঘটনায় রানির উপর স্বামীজীর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উষা দেবী : শংকর পাণ্ডুরঙ্গের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী উষা দেবী (১৮৫৬-১৯৩৮)। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতকালে তাঁর বয়স ছিল ছত্রিশ বছর। প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্রয়াতা হলে ১৮৬৮ সালে শংকরজী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। পাণ্ডুরঙ্গ ও উষা দেবীর তিন কন্যা ও দুই পুত্র—তারা (জন্ম ১৮৭২), মাধব (১৮৭৬), ক্ষমা (১৮৮০), ভামন (১৮৮৩) এবং ভদ্রা (১৮৮৬)। শংকরজী পোরবন্দর এস্টেটের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে থাকায় সংসারের

নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ দেখার সুযোগ পেতেন না, উষা দেবীকেই গৃহের সব কাজকর্ম দেখতে হত। পাঁচ সন্তানের শিক্ষাদানের ব্যাপারেও তাঁকেই নজর রাখতে হত। তাঁরা সকলেই স্বামীজীর স্নেহভাজন ছিলেন। প্রথমা কন্যা তারা সম্ভবত বালবিধবা ছিলেন। দ্বিতীয়া ক্ষমা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখিকা। তাঁর বিবাহ হয় বোম্বাইয়ের ড. ভি রাওয়ের সঙ্গে। তাঁদের কন্যার নাম লীলারাও দেওয়াল। ভদ্রার বিবাহ হয়েছিল মারগাওকরের গোবিন্দ রাওয়ের সঙ্গে। তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। মাধব ব্যারিস্টার হন, আর ভামন শিল্পী।

চিমনাবাই

উষা দেবী খুব ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি পূজার মতো শুদ্ধাচারে স্বামীজীর জন্য রন্ধন করতেন। তাঁর অন্তঃকরণে নিয়ত মাতৃভাব জাগ্রত থাকত। তাঁরা নিরামিষাশী, অথচ জানতেন যে স্বামীজী আমিষ ভালবাসেন। আমিষ রান্না সম্ভব হত না বলে উষা দেবী চেষ্টা করতেন বিভিন্ন পদ তৈরি করতে। স্বামীজী যখন পাণ্ডুরঙ্গ-পরিবারে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, তখন একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, তিনি নানা সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে পারেন এবং নিরামিষ পদগুলি শিখিয়েও দিতে পারেন। এভাবে তিনি এঁচোড়ের ঝোল, কাঁচকলার কোপ্তা, আলুর দম, ধোঁকার ডালনা, পটলের দোরমা প্রভৃতি রান্না শিখিয়েছিলেন। এইসব বাঙালি পদ পাণ্ডুরঙ্গ-পরিবারে খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। স্বামীজী মাঝেমাঝে গান গাইতেন, শংকরজীর কন্যাদের গান গাইতে উৎসাহিত করতেন। সেইসঙ্গে পাণ্ডুরঙ্গের সন্তানদের জ্ঞানলাভ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের শিক্ষা দিতেন।

উষা দেবী

ক্ষমা রাও : শংকর পাণ্ডুরঙ্গের দ্বিতীয়া কন্যা ক্ষমা রাও (১৮৮০-১৯৫৪) বহু সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িত্রী। স্বামীজীর সঙ্গে যখন তাঁর সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি দশ-এগারো বছরের বালিকা। তিনি পিতার জীবনী সংস্কৃতে রচনা করেন, নাম— শংকরজীবনাখ্যায়নম্। সেই গ্রন্থে স্বামীজী সম্পর্কে যা লিখিত হয়েছে তার অনুবাদ এরকম : ''সমকালে বহু ব্যক্তিই পাণ্ডুরঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁদের গৃহে অতিথি হয়ে অবস্থান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে। দ্বারকা থেকে স্বামীজী নৌকায় ভোজেশ্বর বাংলোয় এসে জানতে চান গৃহস্বামী কে। জেনে নিয়ে তিনি শংকর পাণ্ডুরঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অভিলাষী হন।

''শংকরজী বিদ্বান ও বুদ্ধিমান অতিথিদের পছন্দ করতেন। যখন তিনি দেখলেন সাক্ষাৎপ্রার্থী স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ, তখন তিনি সোৎসাহে তাঁকে

নিজগৃহে থাকার জন্য অভ্যর্থনা জানালেন। প্রত্যহ স্নান ও পূজা সমাপনান্তে স্বামীজী বিশ্রাম নিতেন। অতঃপর শংকরজী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে খেতে যেতেন। তাঁর দুইপুত্র তখন স্বামীজীর দুই হাত জড়িয়ে ধরত। স্বামীজী তাদের এই আহ্লাদ মেনে নিতেন।... তিনি আমাদের নানান গল্প বলতেন যা আমাদের মনে ভীষণ কৌতূহল জাগাত।

''শংকরজী খেতে খেতে স্বামীজীর সঙ্গে উৎসাহব্যঞ্জক ও গঠনমূলক নানা বিষয়ে কথা বলতেন। তিনি অতঃপর স্বামীজীকে সমুদ্রতীরে, কখনও বা পোরবন্দরের নানা দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যেতেন। স্বামীজী আমাদের নিয়ে সমুদ্রতীরে যেতেন। দুই ভাইকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন তিনি। আমরা বোনেরা পরিচারিকার সঙ্গে বালুকাবেলায় খেলা করতাম এবং বালির ঘর তৈরি করতাম। কখনও বা পরস্পর হাত ধরাধরি করে বালির ঘরকে বেষ্টন করে গান গাইতাম। আমাদের গান শুনে স্বামীজী মাঝেমাঝে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। তিনিও মিষ্টসুরে গান গাইতেন। আমাদের ভারি ভাল লাগত। সে ছিল এক অপূর্ব দৃশ্য—যোগীবর শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতো ক্রীড়ারত।

''সন্ধ্যার সময় স্বামীজী ও শংকরজী ঘোড়ার পিঠে চড়ে দূর দূর স্থানের গ্রামগুলি পরিদর্শনে বের হতেন। স্বামীজী রাঁধতে পারতেন ভাল। তিনি আমাদের মাকে নানারকম নিরামিষ ব্যঞ্জন রাঁধার কৌশল শিখিয়েছিলেন।''[৪]

এই রচনায় স্বামীজীর প্রতি লেখিকার বিনম্র শ্রদ্ধা ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। পরিশেষে তিনি জানাতে কুণ্ঠিত হননি যে তাঁর সাহিত্যজীবনের সাফল্যের পিছনে আছে স্বামীজীর উৎসাহ, প্রেরণা ও আশীর্বাদ।

'সানডে স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা ১৯৫৫ সালের ৬ মে তারিখে ক্ষমা রাও প্রসঙ্গে মন্তব্য করে : ''Never before in the history of Sanskrit literature had a woman written such original works of outstanding merit. And so many of them. For Pandita Row is the author of nine epics, five full length dramas, even short plays and thirty five short stories, all in Sanskrit. In 1953, she wrote her father's biography, 'Sankar Jeevan Akhyanam' (in Sanskrit) for which she was awarded the title of 'Sahitya Chandrica'.''

জয়লক্ষ্মী সারাভাই : স্বামীজী গুজরাতের পালিতানা পরিভ্রমণকালে সেই রাজ্যের দেওয়ান চুনিলাল সারাভাই হজরতের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। স্বামীজীর আগমনবার্তা পেয়ে তাঁর কন্যা জয়লক্ষ্মী দেবী স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁর জন্ম ২১ এপ্রিল ১৮৭৩। ১৮৮৫ সালে বারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর স্বামী মাদ্রাজের অধিবাসী। জয়লক্ষ্মী দেবীর পৌত্র কন্যাকুমারিকা বিবেকানন্দ কেন্দ্রের আজীবন সদস্য এইচ অঙ্গিরস (৮৮) বর্ণিত তথ্য থেকে সারাভাই পরিবারের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাতের বিবরণ জানা যায়। জয়লক্ষ্মী দেবী বলতেন, স্বামীজী যে-কয়দিন তাঁদের গৃহে অবস্থান করেছিলেন গৃহের সকলকে আনন্দে মশগুল করে রেখেছিলেন। কেবল ধর্মকথাই নয়, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য—এমন নানা প্রসঙ্গ আলোচনায় নিবিষ্ট হতেন তিনি। চুনিলালবাবুর সঙ্গে রাজ্যের প্রজা উন্নয়ন এবং জমির জরিপ প্রসঙ্গেও আলোচনা করতেন। তিনরাত্রি কাটিয়ে স্বামীজী যখন পালিতানা ত্যাগ করেন তখন সকলে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। স্বামীজীর কথা শুনলেই বোঝা যেত যে তিনি ভারত পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি কেবল উল্লেখযোগ্য তীর্থ ও মন্দিরই দর্শন করেননি, সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যাগুলি

ক্ষমা রাও

জয়লক্ষ্মী সারাভাই

উৎসাহ দিতেন এবং কিশোর-কিশোরীদের বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে নিয়ত সচেষ্ট থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের অনুধ্যানেই তাঁর সময় কাটত। তরুণদের বলতেন স্বামীজীকে সামনে রেখে দেশের স্বাধীনতার কাজে জীবন সমর্পণ করতে। ২৮ মে ১৯৫৬ তারিখে তিরাশি বছর বয়সে জয়লক্ষ্মী শ্রীরামকৃষ্ণ নাম স্মরণ করতে করতে পরলোকে যাত্রা করেন।

এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় বলতেন যে, শুনলেই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত। তাঁর ব্যক্তিত্ব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যে সেই আলোকদীপ্ত পুরুষকে না দেখেছে তাকে বোঝানো যাবে না, তিনি কেমন! বাস্তবিক সেই সন্ন্যাসীর সেবা করতে পেরেই তাঁদের জীবন ধন্য হয়েছে।

জয়লক্ষ্মী দেবী স্বামীজীর স্মৃতি ভুলতে পারেননি। তিনি স্বামীজীর মুখে তাঁর কন্যাকুমারী গমন অভিলাষের কথা শুনেছিলেন। সেকথা স্মরণ করে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে গিয়ে কন্যাকুমারিকা যান। তিনি ও তাঁর স্বামী কৃষ্ণলাল ধুরু স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে ও কথায় মুগ্ধ হন। জয়লক্ষ্মী দেবী স্বামীজীর ভাব ও ভাবনায় আপ্লুত হয়ে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে আমৃত্যু সেই পত্রিকার সদস্য ছিলেন। তিনি সারাজীবন চেষ্টা করে গেছেন যথাসাধ্য অন্যকে সাহায্য করতে। অঙ্গিরস জানান যে, তাঁর পিতামহী অর্থস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও ছিলেন নিরাভরণ, নিরহংকারী ও নির্মোহ। সাহিত্যরসিক ছিলেন তিনি। স্থানীয় পাঠাগার গঠনে অর্থসাহায্য করতেন, সংগঠকদের

কেশর বাই: স্বামীজীর বাংলা জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তিনি মাণ্ডবীতে এক বৃদ্ধা শেঠীর গৃহে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে জানা যায় স্বামী অখণ্ডানন্দের বিবরণীতে : ''মাণ্ডবীতে পৌঁছে গোকুলে গোঁসাই-এর শিষ্য কেশর বাঈ-এর বাড়িতে স্বামীজীকে ধরলুম।...

''(স্বামীজী) পরে আমাকে বললেন, 'কেশর বাঈ-এর কাছে কৃষ্ণকথা একলা উপভোগ করতে পারছিলুম না। মনে হচ্ছিল, তারকদা কি বাবুরাম কেউ যদি থাকত কাছে খুব রগড় হতো।... এদের কৃষ্ণকথার রগড়টা শোন। এই বলে তিনি তাদের রগড়ের কথা শোনাতে লাগলেন—হেসে হেসে পেটে খিল ধরে গেল।... কেশর বাঈ খুব দানশীলা।''[৫]

জানা যায়, বর্তমান মাণ্ডবী স্টেশন রোডের কাছে ছিল বুনিয়াচাঁদ শেঠের কুটির। শেঠজীর অকস্মাৎ মৃত্যু হলে তাঁর বিধবা স্ত্রী এক কন্যাকে নিয়ে সেখানে অবস্থান করতেন। শেঠজী ছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী। তিনি খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তীর্থযাত্রী সাধু-সন্ন্যাসীদের সাগ্রহে নিজভবনে

ডেকে আনতেন। তাঁর বিধবা স্ত্রীর নাম কেশরবাই। কেশরবাইয়ের পিতার নিবাস ছিল পোরবন্দরে। পোরবন্দর নিবাসী দিনকারী বৈষ্ণব (৯৯) জানিয়েছেন, তিনি যুবক বয়সে পোরবন্দরের কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলাকে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে দেখেছিলেন। তাঁর পিতা সত্যাগ্রহী রণছোড়জী বলেছিলেন, সত্যাগ্রহী মহিলাদের মধ্যে একজন ছিলেন মাণ্ডবীর বাসিন্দা। তাঁর মুখে রণছোড়জী শুনেছিলেন যে, তাঁদের বাড়িতে বহু সাধুসন্ন্যাসী তীর্থযাত্রাকালে এসে বিশ্রাম নিতেন। একবার একজন বাঙালি সাধু কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি এত ভাল গান গাইতেন যে পাড়ার মহিলারা তা শোনার জন্য তাঁদের বাড়িতে সমবেত হতেন। সেই সাধু তাঁদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ''মা আপনারা শক্তিরূপা। দেশের কাজে আপনারা না এলে দেশ জেগে উঠবে না। এ-জীবন ব্যর্থ, যদি না তা দেশের কোনও কাজে লাগে। পাতা সবুজ থাকতেই সব কাজ হয়। শুকনো হলে তা জঞ্জাল অথবা আগুন সংযোগে ভস্ম হয়ে যায়। জীবন একটাই। তা যেন কাজে লাগে মা।''

কেশর বাই

তারপর সাধুটি অন্যত্র চলে গেলেন। সাধুর কথা কেশরবাই ভুলেই গিয়েছিলেন। ইত্যবসরে তাঁর কন্যা মারা যায়। তিনি কন্যার বিয়োগব্যথায় জর্জরিত হয়ে পোরবন্দরে এসে থাকতে শুরু করেন। তখন একদিন গান্ধীজীর ভাষণ শুনে সেই বাঙালি সাধুর কথা মনে পড়ে এবং হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে। তিনি ভেবেছিলেন গান্ধীজীর আন্দোলনে অংশ নিলে দেশের কাজ হবে এবং তাহলেই জীবন সার্থক হবে। তিনি বলতেন, ''ঘরের বউ হয়ে এভাবে বাইরে আসার সাহস পেতাম না, যদি না সেই বাঙালি সাধুর সঙ্গে দেখা হত, যদি না তাঁর সেই উদাত্ত বাণী শুনতাম।''

অনুমান করা যায় যে, দিনকারী বৈষ্ণব ও তাঁর পিতার দেখা সত্যাগ্রহী মাণ্ডবীর মহিলার গৃহেই সম্ভবত স্বামীজীই অবস্থান করেছিলেন। 'গানজানা বাঙালি সাধু' হিসেবে স্বামীজীর কথাই সর্বাগ্রে স্মরণে আসে।

এইভাবে স্বামীজীর গুজরাত ভ্রমণ তাঁর চরিত্রের বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে ব্যক্ত করে।

তথ্যসূত্র

১। Fatesing Rao Gaekward, *Sayaji Rao of Baroda–The Prince and The Man* (Popular Prakashana : Bombay, 2007), p. 226-27

২। *Souvenir of Swami Vivekananda.* Baroda Ramakrishna Mission, 2008

৩। সম্পাদনা : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *স্বামী অভেদানন্দের কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ* (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ : কলকাতা ১৯৮৪), পৃঃ ৫৬

৪। দ্রঃ *Vedanta Kesari, February, 2006*

৫। সংকলক : স্বামী চেতনানন্দ, *স্বামী অখণ্ডানন্দকে যেরূপ দেখিয়াছি*, স্বামী ওঙ্কারেশ্বরানন্দ লিখিত *স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতি* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৯৯), পৃঃ ২৭